Prantik Gabeshana Patrika ISSN 2583-6706 (Online)
Multidisciplinary-Multilingual- Peer Reviewed-Bi-Annual
Digital Research Journal
Website : santiniketansahityapath.org.in
Volume-3 Issue-2 January 2025

লীলা মজুমদারের শিশুসাহিত্য

তিস্তা দত্ত রায়

Link : https://santiniketansahityapath.org.in/wp-content/uploads/2025/02/12_Tista-Datta-Roy.pdf

সারসংক্ষেপ: লীলা মজুমদারের প্রায় সব গল্পই ১০ থেকে ১৬ বছর বয়েসিদের জন্য লেখা হলেও তা সব বয়সের পাঠককেই আনন্দ দেয়। বিখ্যাত রায় পরিবারের উত্তরসূরী তিনি। শিশু সাহিত্য রচনায় তাঁকে প্রেরণা দিয়েছিলেন জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর। তাঁকে সাহিত্য ক্ষেত্রেও নিয়ে আসেন দাদা সুকুমার রায়। 'সন্দেশ' পত্রিকায় তাঁর প্রথম গল্প 'লক্ষ্মী ছেলে' প্রকাশিত হয়। লীলা মজুমদারের নাম বাদ দিয়ে বাংলা শিশু-কিশোর সাহিত্যের কথা ভাবা যায় না।

সূচক শব্দ: শিশু সাহিত্য, কৈশোর, সন্দেশ, লীলা মজুমদার

যতই দিন গিয়েছে ততই বুঝতে পেরেছি যে, বড়োদের জন্য আমার করবার কিছু নেই।... আমার প্রায় সব গল্পই যাদের বয়স ১০ থেকে ১৬ তাদের জন্য লেখা। এই সহজ অকপট স্বীকারোক্তি যাঁর, তাঁর লেখা কেবল ১০ থেকে ১৬ নয়, বরং বলা ভালো সে অর্থে কোনো বয়সের বাধাই মানে না — তিনি লীলা মজুমদার, বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল নাম। যাঁর স্বল্প সাহিত্য সম্ভার নিয়েই তিনি শিশু সাহিত্যে স্বতন্ত্র আসনের দাবিদার। সারা জীবন ধরে তিনি লিখেছেন কেবল ছটোদেরই জন্য এবং তাঁর লেখায় আছে সেই আশ্চর্য দীপ্তি, তিনি তা বংশানুক্রমে পেয়েছেন। বিখ্যাত 'রায়চৌধুরী' পরিবারের সার্থক উত্তরসূরী হয়েও মহৎ প্রতিভাকে মেলে ধরেছেন কেবল শিশুদের জন্য। তাঁর প্রতিভার যোগ্য মূল্যায়ন আজও হয়নি, এ অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়। অবশ্য 'শিশু' শব্দটির পরিধি নিয়েও বিস্তর মতান্তর আছে। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, মানুষের জীবনের শৈশব, যৌবন, বার্ধক্য কালের তিনটি স্পষ্ট ভাগের মতো শিশু সাহিত্যেও বিভাজন আছে। জন্মের পর, বেড়ে ওঠার সময় থেকে ৫/৬ বছর পর্যন্ত বয়সকে শৈশব, ৬/৭ থেকে ১১/১২ বছরকে বাল্যকাল ও তারপর থেকে ১৬/১৭ বছর পর্যন্ত কৈশোর — এই মোটামুটি ভাগ আমরা করতে পারি। কিন্তু 'শিশু সাহিত্য' কথাটি বলার ক্ষেত্রে আমরা সমস্ত বয়সগুলিকে এক সঙ্গো মিশিয়ে ফেলি, যদিও ৬/৭ ও ১৬/১৭ বছর বয়সের ভাবনা চিন্তার দুরূহ ব্যবধান থাকাই স্বাভাবিক। রায় বাড়ির ঐতিহ্য অনুসারে, প্রায় সব সদস্যরাই — এই তিনটি বয়সকে বেছে নিয়েছেন সাহিত্য রচনার জন্য। এই পরিবারের বিখ্যাত তিন পুরুষের মধ্যে উপেন্দ্রকিশোর কলম ধরেছিলেন শৈশবের জন্য, সুকুমারের রচনা বাল্যকাল ও তাঁর উত্তরপ্রান্তকে স্পর্শ করেছে আর সত্যজিৎ মূলত কিশোরদের লেখক। সুকুমারের পিতৃব্য-পুত্রী লীলা মজুমদার বেছে নিয়েছিলেন এই বাল্য-কৈশোরের সময় সীমাকেই। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সুকুমার-সাহিত্যের মতো তাঁর রচনাও এই সীমানা ছাড়িয়ে যায়।

ছেলেবেলার শিলং বাসের শৈশব স্মৃতি তাঁকে সাহায্য করেছিল লেখক হয়ে উঠতে। নিজের রচনা সম্পর্কে তিনি জানিয়েছেন, "ছোট বেলা থেকে যা দেখেছি, যা শুনেছি, যা ভেবেছি, তিল তিল করে তাই দিয়ে এসব গল্প তৈরী হয়েছে। যেখানে যত ভালো জিনিস, মজার জিনিস, অদ্ভুত জিনিস, লোম খাড়া করা জিনিস খুঁজে পেয়েছি, সব দিয়েছি পুরে এই লেখার মধ্যে।" ছটোবেলায় যে মানুষটি তাঁকে সাহিত্যের দিকে প্রেরণা দিয়েছিলেন তিনি জ্যাঠামশাই উপেন্দ্রকিশোর এবং তাঁর সম্পাদিত পত্রিকা 'সন্দেশ'। এতে প্রকাশিত কবিতা, গল্প, ছবি, ধাঁধা ছটো লীলাকে অনুপ্রাণিত করেছিল। কিন্তু তাঁকে সাহিত্যে নিয়ে আসেন দাদা সুকুমার এবং সারা জীবন তাঁর আদর্শ হয়ে থাকেন। শিশু সাহিত্যে তিনিই সুকুমারের যোগ্য উত্তরসূরী। মূলত তাঁরই আগ্রহে ১৩৩০

সালের ভাদ্র সংখ্যা 'সন্দেশ' এ লীলার প্রথম গল্প প্রকাশিত হলো 'লক্ষ্মী ছেলে' নাম দিয়ে।

লীলা মজুমদারের রচনা সম্ভারের মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'পদি পিসির বর্মিবাক্স', 'হলদে পাখির পালক', 'হাওয়ার দাঁড়ি', 'বাতাস বাড়ি', 'গুপুর গুপ্তখাতা', 'নেপোর বই', 'বকধার্মিক', 'ভূতোর ডাইরী', 'টংলিং' প্রভৃতি কয়েকটি উপন্যাস, 'বক-বধ পালা', 'লঙ্কাদহন পালা'র মতো দু'তিনটি নাটক, বেশ কিছু ছোটগল্প ও প্রবন্ধ। সাহিত্যিক সংরূপ আলাদা হলেও এদের এই সব কয়টিতেই মিশে আছে এক অনাবিল ভালো লাগার বোধ — জীবনের প্রতি এই ভালোবাসাই লেখিকার জীবনদর্শন। তাঁর কথায় "আজ পর্য্যন্ত যত লোক দেখি, প্রায় সক্কলকে ভালো লাগে, এই ভালো লাগাটা এক তরফা হলেও ভালো লাগে, আমার সব চিন্তা, সব কাজের পিছনে, সবাইকে আর প্রায় সব কিছুকে এই ভালো লাগাটা কাজ করে।" তাই তাঁর লেখায় জড়িয়ে থাকে এক মমত্ববোধ, এই মমত্ব কিন্তু বাৎসল্য নয়, অন্য কিছু, যা আমাদের কৈশোরকে নাড়া দেয়। এই বৈশিষ্ট্য থাকে তাঁরই লেখায়, তিনি নিজের শৈশবকে কখনো হারিয়ে ফেলেন না। এ প্রসঙ্গো সাহিত্যিক রাজশেখর বসু বলেছেন "আমরা ছেলেবেলায় মাঝে মাঝে যে অদ্ভুত লোকের সংস্পর্শে আসি বড়ো হলে তা ভুলে যাই। দৈবক্রমে কেউ কেউ বড়ো হয়েও বাল্যের দিব্য দৃষ্টি বজায় রাখেন, এরাই সার্থক শিশু সাহিত্য লিখতে পারেন।"— লীলা মজুমদার এঁদেরই একজন।

একথা মানতেই হবে যে, তাঁর লেখার বৈশিষ্ট্য 'রূপায়ণের অভিনবত্বে', বিষয় বৈচিত্র্যের দিক থেকে নয়, তিনি লিখেছেন, সেই ছটো ছেলেটিরই গল্প যে আমাদের অতি চেনা যে আর পাঁচটা ছেলের মতো অবাক হয়ে চেয়ে দেখে, সব কিছুতে যার দারুণ কৌতূহল যে ভীষণ দুরন্ত, কিন্তু উৎসাহে ভরপুর, বড়োদের মতো নকল-গম্ভীর বাচনভঙ্গিতে পটু — আবার ভালো মানুষির আড়ালে দুর্দান্ত মজা তৈরিতেও সিদ্ধহস্ত। একটু উদাহরণ দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হবে — " 'নগা রেগে বলল — অত হাসির কথা কি হল শুনতে পারি? ছেলেটা অমনই নরম সুরে বলল — কিছু মনে কোরো না ভাই, সত্যি আমার হাসা উচিত হয়নি, কিন্তু তোমাদের দেখে আমার হঠাৎ মেজো মামার পোষা বাঁদরগুলোর কথা মনে পড়ে গেল। কেবল ওই ওকে ছাড়া —' বলে আমাকে দেখিয়ে দিল। নগারা রেগে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল। আমি কিন্তু একটু খুশি না হয়ে পারলাম না, অল্প থেমে জিজ্ঞেস করলাম — আর আমাকে দেখে কিসের কথা মনে হয়? সে অম্লান বদনে বলল — 'মূলতানি গোরুর কথা।' " (নটবরের কারসাজি)

লীলা মজুমদারের লেখার আরেক বিশেষত্ব হলো, তিনি 'লেখিকা' হলেও বারবার লিখেছেন 'বালক' বা কিশোরদেরই প্রধান চরিত্র করে। অবশ্য এতে আমাদের কোনো আপত্তিই থাকে না, আমরা যখন দেখি তিনি বালক মনের নানা কোণের সন্ধান করেছেন নিপুণভাবে। তাই গুপী, গণশা, নটবরকে চিনতে আমাদের কিছু মাত্র সময় লাগে না। বালক-কিশোর মনের সেই চাবিকাঠি কী করে যেন পৌঁছে গেছিল তাঁর হাতে। কিছু গল্পে যেমন তিনি 'আমি' নামক প্রথম পুরুষের সাহায্য নিয়েছেন। এই 'আমি' একদিকে যেমন চরিত্রের নানা কাণ্ডকারখানা পাঠককে শোনাচ্ছে, আবার অন্যদিকে চরিত্রদের সঙ্গো মিশে, উক্তি-প্রত্যুক্তিতে গল্প এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আর এই কৌশলেই লেখিকা তাঁর উদ্দিষ্ট পাঠকের নিজের লোক হয়ে যাচ্ছেন, আর লেখক হয়ে দূরে দাঁড়িয়ে থাকছেন না। কয়েকটা উদাহরণ দেওয়া যায় — "আয়না দেখে আঁৎকে উঠলুম। এতো আমার সেই চিরকেলে চেহারা নয়! সেই যাকে ছোটোবেলা দেখেছিলুম নেড়া মাথা, নাকে সর্দি, চোখ ফুলো। তারপর দেখেছিলুম চুল খোঁচা, নাক খাঁদা, গালে টালে কাজল। এই সেদিনও দেখলুম খাকি পাৎলুন, ময়লা সার্ট, মুখে কালি। এমনকি আজ সকালেও দেখেছি কালো কোট, ঝাঁকড়া চুল, রাগি রাগি ভাব।... (আপদ) বা সেবার প্রিটেস্টে অঙ্কে পনেরো পেলাম। তাই নিয়ে বাড়িময় সে যে কি রকম হইচই লেগে গেল সে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। বাবা পর্যন্ত এমন কাণ্ড আরম্ভ করলেন যে, শেষ অবধি বাড়ি ছাড়তে বাধ্য হলাম।" — এমন ভাষা আর লেখার কৌশল যে, লেখিকা এখানে সহজেই বালক মনের সঙ্গো মিশে গেছেন, তাতে আর সন্দেহ থাকে না।

আর এখানেও বারবার ঘুরে ফিরে আসে সুকুমারের প্রসঙ্গ, একই পারিবারিক যোগসূত্রতা থাকায় উভয়ের লেখায় কিছু মিলও দুর্লক্ষ্য নয়। 'পাগলা দাশু'র সঙ্গে 'দিনে দুপুরে' বা 'গুপী' সিরিজের বইগুলি মিলিয়ে পড়লে তা আরো স্পষ্ট হয়। এ প্রসঙ্গে সমালোচকের মন্তব্য — "এই দুটি বইয়ের প্রাথমিক মিল হল দুটিই মূলতঃ স্কুল স্টোরি। বিদ্যালয় জীবন বা গৃহশিক্ষক বা পড়া তৈরিই এক্ষেত্রে গল্পের বিষয়। ছাত্রের কর্তব্য ও আকাঙ্খা এই দুইয়ের বিরোধী, তা থেকে জাত সমস্যা ও তার সমাধান — কী ভাবে সাধারণ পটভূমিকে বিস্ময়ের শূন্যে উৎক্ষিপ্ত করতে পারে, তা দুজন লেখকই দেখিয়েছেন।' দুজনের লেখাতেই মূল চরিত্র (দাশু বা গণশা বা গুপী) ঈষৎ অপ্রকৃতিস্থ গোছের হলেও দুষ্টের দমন (দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার বা গর্হিত কোনো কাজ করে অপরাধীর পার পেয়ে যাওয়া ইত্যাদি) করে পাঠককে খুশী করে। তাই লীলা মজুমদারের গল্পে যতই আজগুবি বা কাল্পনিক কথা থাকুক না কেন, আদর্শবাদের কথাও আছে। মন্দ কাজের শাস্তি এখানে পেতেই হয়। তাই 'বদ্যিনাথের বড়ি'তে ছাত্র পীড়ক মাস্টারমশাই ছাত্রের দেওয়া বড়ি খেয়ে মানুষের পূর্বপুরুষে রূপান্তরিত হয়ে পাঁচিলে লেজ ঝুলিয়ে বসে থাকেন আর 'ভূতের ছেলে' গল্পে অন্যায় কাজ করে ভূতের ছানাও মানুষ দারোয়ানের কানমলার হাত থেকে রেহাই পায় না। কিন্তু এই শিক্ষা কখনো জ্ঞান দেবার মতো করে চাপিয়ে দেওয়া হয় না। গল্প পড়তে পড়তেই তা নীরবে পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে যায়। এর আরেকটা কারণ, লেখিকার নির্মল হাস্যবোধ। এই হাসি একদিকে যেমন তাঁর অন্তরের উৎসজাত, অপর দিকে উপেন্দ্রকিশোর ও বিশেষ করে সুকুমার তাঁকে সেই পাঠে দীক্ষিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে লেখিকা নিজেই জানিয়েছিলেন — "মোট কথা, বড়দা আমাদের প্রথম ও শেষ হাসির পাঠ দিয়েছিলেন। জ্যাঠামশায়ের লেখায় যথেষ্ট সচেতনতা ছিল। কিন্তু সে-সব হল প্রাসঙ্গিক হাসি আর বড়দার বেলায় হাসিটাই ছিল প্রসঙ্গ। সেই হাসি ধরিয়ে দিলেন বড়দা।" তবু এঁদের থেকে লীলা মজুমদার আলাদা। তাঁর হাস্যরসের ধরণ সম্পর্কে সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু তাঁর 'শিশু সাহিত্য' প্রবন্ধে জানিয়েছেন "তাঁর গল্পে কখনোই আমরা চেঁচিয়ে হাসি না, কিন্তু আগাগোড়াই মনে মনে হাসি — আর শেষ করে উঠে ভাবতে আরো বেশি ভালো লাগে।" তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস 'পদি পিসির বর্মিবাক্স' থেকে উদ্ধৃতি দিতে পারি — গল্পে দেখি পদি পিসি যখন জানলেন খুড়োই ডাকাত দলের সর্দার, তখন "খুড়ো আস্তে আস্তে সেইখানে উপস্থিত হয়ে বললেন — "তোমায় পঞ্চাশ টাকা দেব যদি ডাকাতের কথা কাউকে না বল', পদি পিসি এক মনে রাঁধতে লাগলেন। খুড়ো বললেন — 'একশো টাকা দেব'। পদিপিসি একটু হাসলেন, খুড়ো বললেন 'পাঁচশো টাকা দেব', পদি পিসি একটু কাশলেন। খুড়ো মরিয়া হয়ে বললেন — 'হাজার টাকা দেব, পাঁচ হাজার দেব, আমার লোহার সিন্দুক খুলে দেব। যা খুশি নিয়ো।' পদি পিসি খুন্তি কড়া নামিয়ে রেখে সোজা সিন্দুকের সামনে উপস্থিত হলেন।... দু'হাত জড়ো করে একটিপি ধনরত্ন মাটিতে নামালেন। আর একটা হাঙরের নক্শা-আঁকা লাল বর্মিবাক্সও টেনে নামালেন। খুড়ো হাঁ হাঁ করে ছুটে এসে বললেন — 'আহা, ওটা থাক, ওটাতে যে আমার প্রাইভেট পেপার আছে!' পদি পিসি থপ্ করে মাটিতে থেবড়ে বসে বললেন — 'চোপরাও শালা। নয়তো সব প্রাইভেট ব্যাপার খবরের কাগজে ছেপে দেব।"

লীলা মজুমদারের লেখায় আমরা প্রকৃতির এক অসামান্য রূপ দেখি বা বলা ভালো প্রকৃতিকে দেখার, তাকে অনুভব করার চোখ খুলে দেন তিনি। ছেলেবেলা যে কেবল শুষ্ক শিক্ষা বা নীরস জ্ঞানের সময় নয়, প্রকৃতির সঙ্গে মিশে থাকার বা তাকে চেনারও সময়, একথা তিনি ভোলেন নি। আমাদের এ প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার, তাঁর পিতা কাজ করতেন ভারত সরকারের বনদপ্তরের জরীপ বিভাগে এবং কাজের সূত্রে তাঁর ভারত ও বার্মার নানা জায়গা ঘোরার অভিজ্ঞতা ছিল। 'বনের খবর' নামে 'সন্দেশে' ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হতো। সেই লেখা, বাবার কাছে শোনা গল্প এবং শিলং বাসকালে প্রকৃতিকে একেবারে নিবিড় করে পাবার অভিজ্ঞতা তাঁকে একাজে সাহায্য করেছিল। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তাঁর একান্ত নিজস্ব অনুভব, না থাকলে একে এমনভাবে বাঙ্ময় করে তোলাও অসম্ভব বলা যায়। তাঁর দুটি অনবদ্য স্মৃতিচারণ মূলক গ্রন্থ 'পাকদণ্ডী' এবং 'আর কোন খানে' — তে এই ধরণের অজস্র পংক্তি মণি মুক্তোর মতো ছড়িয়ে আছে। "আমি টের পাই, আমার পায়ের আঙুলের ফাঁক দিয়ে ঝুরঝুর করে বালি সরে যাচ্ছে। মাঝে মাঝে পায়ে আস্তে কিসের খোঁচা লাগছে —

তুলে দেখি আমার কড়ে আঙুলের নখের চেয়েও ছোটো শাদা একটা শামুক।" বা "মাঝে মাঝে চেয়ে দেখি, গুবরে পোকা মার্বেলের মতো মাটির ঢেলা ঠেলে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে। যতই এগুচ্ছে ঢেলা ততই বড় হচ্ছে। বোলতা দেখতে পাই, খালি ফুলে ফুলে উড়ে বেড়াচ্ছে। তারপর দেখতে পাই, স্নানের ঘরের দরজার পাশে ছাতের আলসের নিচে কেমন সুন্দর চাক বানাচ্ছে।" এই প্রকৃতির রূপ আমাদের তাঁর উত্তরসূরী সত্যজিতের 'সদানন্দের ক্ষুদে জগৎ' গল্পের কথা মনে পড়ে পড়ায়। আর এই প্রকৃতিকে চেনানোর পাশে তিনি তাঁর গল্পে ছটো ছটো বাক্যে যে ডিটেলসের ব্যবহার এনেছেন, তা অনবদ্য — "এই বলে ছোটোমামা এত জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন যে টেবিলের ওপরকার কাগজচাপাটা একটু সরে গেল।" কোথাও আবার আসছে গল্পচ্ছলে সাধারণ জ্ঞানের কথাও — "দিদিমা আমাকে ঝকঝকে মাজা কাঁসার গেলাসে করে জল খেতে দেয় আরা হাতে একটা লালচে বাতাসা দেয়। আমি জলের মধ্যে বাতাসাটাকে যেই ফেলি, বাতাসাটাও অমনই জল টুস-টুস হয়ে ডুবে যায়। তক্ষুনি চোঁ চোঁ করে জলটা খেয়ে ফেলতে হয়। নইলে গুঁড়ো হয়ে যায়।" আবার কখনো শাস্তির অভিনবত্বও আমাদের কৌতুকের উদ্রেক করে "... ঘোতন খুব লক্ষ্য করে দেখল, পিসিমা এসে নিবিষ্ট মনে খোকনাকে ঠ্যাঙাচ্ছেন। প্রথমে ডান কান প্যাঁচালেন, তারপর বললেন, 'হতভাগা ছেলে!' তারপর বাঁ গালপট্টিতে চাঁটালেন, তারপর বললেন, "তোকে আজ আমি", তারপর বাঁ কান প্যাঁচালেন — 'আদা লঙ্কা দিয়ে ছেঁচব।' তারপর ডান গালপট্টিতে চাঁটালেন — 'তেল নুন দিয়ে আমসি বানাব।' তারপর পিঠে গুমগুম করে গোটাদশেক কিল বসিয়ে, মাথা থেকে চিমটি চিমটি চুল ছিঁড়ে, জুলপি ধরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, ঠিক ভাঁড়ার ঘরের দরজার বাইরে। টিপ দেখে ঘোতন তাঁকে শ্রদ্ধা না করে পারল না।" (আচার)

আজগুবি, অবাস্তব বা অলৌকিকের প্রতি শিশুমনের যে প্রবল আকর্ষণ থাকে, তাকেও লীলা মজুমদার ব্যবহার করেছেন তাঁর গল্পে। কোনো সময় তা ঘটনার মাধ্যমে, যেমন 'গণশার চিঠি'তে দেখি — "মাস্টারমশাই তো আবার ম্যাজিক জানেন, ... ও বাবাগো, মাগো! ইচ্ছে করে ওঁর ইস্কুলে কে যাবে! মানকে স্বচক্ষে দেখেছে, প্রথম সপ্তাহে ঘরের ভেতর সাতটা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে, আর ঘরের বাইরে দুটো ছাগল নটে চিবুচ্ছে, মাস্টারমশাই পা নাচাচ্ছেন। পরের সপ্তাহে মানকে আবার দেখেছে ঘরের ভেতর ছটা ছেলে পেনসিল চিবুচ্ছে আর ঘরের বাইরে তিনটে ছাগল নটে চিবুচ্ছে... শেষটা হয়তো ঘরের দরজায় তালা মারা থাকবে, আর ঘরের বাইরে নটা ছাগল নটে চিবিয়ে দিন কাটাবে!" আবার, কখনো এই অলৌকিক বা ছমছমে পরিবেশ তৈরি করেছেন বর্ণনার সাহায্যে। এক্ষেত্রে তাঁর ভাষা এই রহস্যময়তা তৈরিতে সাহায্য করেছে, যেখানে স্পষ্টতার চেয়ে ধোঁয়াশা বেশি, 'দিন দুপুরে'র একাধিক গল্পে, 'গুপী সিরিজে', 'হলদে পাখির পালক', 'টং লিং', 'হওয়ার দাঁড়ি' প্রভৃতি উপন্যাসে এই 'কি হয়', 'কি হয়' উৎকণ্ঠা পাঠকের মনে নিঃশব্দে কাজ করে যায় চোরা স্রোতের মতো। 'হওয়ার দাঁড়ি' উপন্যাসে বনের বর্ণনা আছে এভাবে — "বনের গাছের মাথার দিকে ঘন পাতা, নিচের দিকটা ন্যাড়া, ঝাড়াঝাপ্টা, ছোটো ছোটো ফুলের ঝোপ। কি সব সড়সড় করে হেঁটে বেড়ায়। বড় বড় গিরগিটির মতো জানোয়ার উঁকি মারে। তাদের জিব সাপের জিবের মতো চেরা, কেমন গা শিরশির করে।" এ যেন এমন জগৎ যেখানে "সত্যি যে কোথায় শেষ হয়, স্বপ্ন যে কোথায় শুরু হয় বলা মুশকিল।" (হলদে পাখির পালক)

এই কথাটিই আরেক ভাবে বলা যায় তাঁর সাহিত্য-জীবন সম্পর্কেও। এখানে কৌতুকের সঙ্গো কল্পনা, বাস্তবের সঙ্গো আজগুবি ঘটনা — হাত ধরাধরি করে চলেছে, কিন্তু কোথাও তা অসঙ্গাত বলে মনে হয় না। জীবনের সত্যি আর সাহিত্যের স্বপ্ন যেন এখানে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। স্মৃতিচারণায় তিনি জানিয়েছেন, ছটোবেলার সব ঘটনা, কথা, চেনা মানুষ যেমন তাঁর মনে জমা হয়ে গেছে, তেমনি জমা পড়েছে কোনোদিন যা ঘটেনি, ঘটবে না, হয়তো ঘটতে পারে না এমন হাজার কথা — এই দুই-ই তাঁকে গল্প জমাতে সাহায্য করেছে। তাই বারবার স্বপ্নের জগৎকে নিয়ে আসেন বাস্তবের সীমানায়। আসে এমন জায়গার কথা, যেখানে যা ঘটতে পারে না, তাই হয়; হয়তো আসে 'সব পেয়েছির দেশ' — যেখানে চাইলেই সব পাওয়া

যায়। কারণ, পৃথিবীর ভালোবাসার জায়গাগুলো অর্ধেক বাস্তব আর অর্ধেক মানুষের মনের তৈরি। ছটোদের জন্য লেখার সময় তিনি এই কথাটাই মনে রেখেছেন। কম কথায় বেশি অর্থ প্রকাশ করেছেন, কারণ তাতে 'রস ঘন হয়'। আর পাথেয় করেছেন জগৎ-জীবনের প্রতি তাঁর একান্ত ভালোবাসাকে। এই চিরন্তন মমত্ববোধ কাজ করেছে নিজের বেলাতেও "বুঝতে পারি, জন্মক্ষণে পরিপূর্ণ-রূপে জন্মাইনি আমি। তারপর থেকে প্রতি মুহূর্তে যা দেখেছি, যা শুনেছি, যা পড়েছি, যা ভেবেছি, যা দিয়েছি, যা পেয়েছি, আর যা পাবার নয়, যাকে শুধু স্বপ্নে দেখেছি, সব মিলিয়ে তিলে তিলে কণা কণা করে 'আমি' তৈরী হয়েছে।" — আর এই 'আমি'ই ছড়িয়ে আছে তাঁর রচনার পাতায় পাতায়, তাঁর পাঠকদের মনে চিরদিনের ছাপ রেখে যায় রামধনুরং এর মতো। তাঁর এই বিশিষ্টতা নিয়েই তিনি বাংলা শিশুসাহিত্যকে চিরদিনের জন্য আনন্দময় ও 'লীলা'ময় করে রেখে নিজের একটি স্বতন্ত্র আসন লাভ করেছেন।

সহায়ক গ্রন্থ:

১. লীলা মজুমদার, 'ভূমিকা', 'লীলা মজুমদার রচনাবলী' ৫ম খণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোং, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৫

২. লীলা মজুমদার, 'ভূমিকা', 'লীলা মজুমদার রচনাবলী' ৩য় খণ্ড, এশিয়া পাবলিশিং কোং, প্রথম সংস্করণ ১৯৮১

৩. বুদ্ধদেব বসু, 'বাংলা শিশুসাহিত্য', 'সাহিত্য চর্চা', দে'জ পাবলিকেশনস, ৩য় সংস্করণ অগস্ট ১৯১৬

৪. কৃষ্ণরূপ চক্রবর্তী, 'সুকুমার রায়ের আশ্চর্য জগত', আনন্দ পাবলিশিং প্রাঃ লিঃ, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩

৫. ব্রততী চক্রবর্তী, 'বাংলা শিশুসাহিত্য চর্চাঃ রায় পরিবার', দে বুক স্টোর, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭

৬. লীলা মজুমদার, 'পাকদণ্ডী', আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৪র্থ মুদ্রণ ২০০১

৭. লীলা মজুমদার, 'আর কোনোখানে', মিত্রও ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম প্রকাশ জুন ১৪১৯

৮. লীলা মজুমদার, 'ছোটদের অমনিবাস', সম্পাদনা-শৈলশেখর মিত্র, এশিয়া পাবলিশিং কোং, প্রথম সংস্করণ ১৯৯৯

লেখক পরিচিতি: তিস্তা দত্ত রায়, সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, রামপুরহাট কলেজ, বীরভূম, পশ্চিমবঙ্গ।